MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
মার্চ-এপ্রিল ২০২১
দাম : দশ টাকা

কঠিন আবরণ ভেদ করে আমেরিকার আসল চেহারা প্রকাশ

বিশ্ব পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাতেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে

কমরেড খালেকুজ্জামান

[৮ ও ৯ জানুয়ারি '২১ বাসদ ৬ নং জোনের শিক্ষাশিবির ভ্যানগার্ড মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষাশিবিরে সম্প্রতি সময়ে অনুষ্ঠিত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনোত্তর অবস্থা এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে দেয়া কমরেড খালেকুজ্জামানের বক্তব্য ছাপা হলো–সম্পাদক]

বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায়, একাডেমিক শিক্ষায়, রাজনৈতিক মহল ও দুনিয়ায় মানুষের সামনে একটা ভুল ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রই একমাত্র গণতন্ত্র। আর সমাজতন্ত্র মানে হলো গণতন্ত্রহীন একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। এর মধ্যদিয়ে তারা সুচতুরভাবে বুর্জোয়া ব্যবস্থা বা পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের পার্থক্য আড়াল করতে চায়। আসলে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র দুই বিপরীতমুখী শাসন এবং এদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট একরূপ হতে পারে না। সাম্য-সমতার বিচার বাদ দিয়ে জনগণের ক্ষমতায়নের হিসাবও সঠিক হয় না। ভোটের অধিকার সবার সমান, একথা বলে আর বাইরের চেহারা দিয়েই অন্তর্গত চরিত্র বৈশিষ্ট নিরূপণ করা চলে না। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্রিটিশ ধরনের গণতন্ত্র দিয়ে শুরু আর আমেরিকান গণতন্ত্রের মধ্যদিয়ে তার পূর্ণতা লাভ করেছে। বলা হচ্ছে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সেরা মডেল হলো আমেরিকান গণতন্ত্র। একটু দেখে নেয়া যাক সেই আমেরিকান গণতন্ত্রের চেহারা।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরে গত ৬ জানুয়ারি ২০২১ ওয়াশিংটন ডিসিতে ক্যাপিটাল হিলে কংগ্রেস ভবনে বিদায়ী রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সমর্থকদের হামলার মধ্যদিয়ে তথাকথিত মডেল গণতন্ত্র একটা ধাক্কা খেয়েছে এবং তার চরিত্র বিশ্ববাসীর সমানে উন্মোচিত হয়েছে। এব্যাপারে আমেরিকান মিডিয়ার মন্তব্যগুলো হলো : 'ট্রাম্প উসকানি দিয়ে একটা অভ্যুত্থান করার চেষ্টা করেছে'; 'এটা ছিল অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসজনিত কাজ'; অপরদিকে ট্রাম্প বলছে–এটা হলো তার বিরুদ্ধে যে ভোট জালিয়াতি হয়েছে তা উদ্ধারের চেষ্টা। মিডিয়া আরও বলছে, 'ধ্বংসাত্মক চেষ্টা'; 'এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের কালো দিবস'; 'আমেরিকার ইতিহাসের কালো অধ্যায়'; তাদের যতগুলো গণতান্ত্রিক নিয়মবিধি সবগুলো প্রশ্নের মুখে পড়েছে; অভ্যন্তরীণ সংঘাতের রাস্তা উন্মোচিত হলো। এর মধ্যদিয়ে তাদের যে নিয়মতান্ত্রিকতা বিধিবিধান, শান্তিপূর্ণ পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তার তা সংঘাতমুখী পথে যাত্রা শুরু করেছে ইত্যাদি।

কেউ কেউ বলছে, ৬ তারিখে যে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড হতে যাচ্ছে, সেটি কোন গোপন ব্যাপার ছিল না। ট্রাম্প বার বার নিজের অনুগত সমর্থকদের ওয়াশিংটন ডিসিতে এসে ইলেকটোরাল কলেজ ভোট গণনা ঠেকাতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে অথচ কংগ্রেস ভবন রক্ষায় অথবা বিশৃঙ্খল দাঙ্গাকারীদের ঠেকাতে কার্যকর কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। যে দ্রুততায় ও বিনা বাধায় দাঙ্গাকারীরা কংগ্রেস ভবনে প্রবেশ করে ব্যাপক ভাঙচুর করে, তাতে প্রশ্ন উঠেছে, তার পেছনে পুলিশ বা নিরাপত্তা কর্মীদেরও কোনো প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অংশগ্রহণমূলক যোগসাজশ ছিল কিনা।

উল্লেখ্য, হামলাকারীদের হামলার অন্যতম লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সও ছিলেন। কারণ ট্রাম্প পেন্সকে অনুরোধ করেছিলেন ইলেকটোরাল কলেজ ভোট গণনার সময় তিনি যেন সম্মতি না দেন। পেন্স সে কথায় রাজি হননি। তাই দাবি উঠেছিল, মার্কিন সংবিধানের ২৫তম সংশোধনী অনুসারে, ট্রাম্পকে সরানো। তাতে বলা আছে, কোনো প্রেসিডেন্ট শারীরিক বা মানসিকভাবে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে মেয়াদ শেষের আগেই তাকে অপসারণ করা যাবে। অনেকে দাবি তুলেছেন এই মুর্হূতেই তাকে অপসারণ (ইমপিচ) করা হোক। তাহলে ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফা ইমপিচমেন্ট হবে। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, চীনসহ নানা দেশ মার্কিনের এই সংকটে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। আরও বহুদিন এই ঘটনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকবে।

এটা যে বল প্রয়োগের উসকানি ছিল তা বুঝা যায় ঘটনার পরে ট্রাম্প তার সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'তোমরা স্পেশাল' এবং 'আমি তোমাদের ভালোবাসি'। আরও বলেছেন 'যখন মহান দেশপ্রেমিকদের কাছ থেকে পবিত্র এবং বিপুল একটি নির্বাচনী বিজয় জঘন্যভাবে ছিনিয়ে নেয়া হয় তার পরিণতিতে এমনটাই ঘটে। আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার এটা একটা সংগ্রামের সূচনা।' এতো গেল কথার মারপ্যাচ দেখতে হবে এই সহিংস ঘটনার আড়ালে বাস্তবতা কী?

বুর্জোয়ারা যখন সামন্তবাদকে মোকাবিলা করেছিল তখন তারা, যে ধারণাগুলো গড়ে তুলেছিল, ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তারা সেটা আর ধরে রাখতে পারেনি, তার বিচ্যুতি হতে থাকে। ফরাসি বিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিল স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব। মার্কস দেখিয়েছিলেন, সমঅধিকার আর

সমবিকাশের সুযোগ সকল জনগণের যদি না থাকে তা হলে সাম্য হয় না। পুঁজিবাদী শোষণের অর্থনীতির যে নিয়ম সে নিয়মের কারণেই সাম্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। সাম্য প্রতিষ্ঠা না হলে বৈষম্য বাড়বে। বুর্জোয়া ব্যবস্থা চলতে চলতে অবাধ প্রতিযোগিতার স্তর থেকে একচেটিয়ার স্তরে গেল। একচেটিয়া থেকে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে প্রবেশ করেছে। ফরাসি বিপ্লবের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, 'বিপ্লবের তিন ঘোষিত লক্ষ্যের মধ্যে একটি 'সৌভ্রাতৃত্ব', বাস্তবে রূপ পেল প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে শঠতা ও শত্রুতায়। গায়ের জোরে দমনপীড়নের জায়গায় এল দুর্নীতি। সমাজ পরিচালনার কলকাঠি হিসাবে তরবারির জায়গা নিল সোনা।'

এখন বহুদলীয় গণতন্ত্র বহু দেশে চলে গেছে দ্বিদলীয় ব্যবস্থায়। আবার কোথায়ও দ্বিদলীয় ব্যবস্থা থেকে একদলীয় ব্যবস্থায়। একদলের নিয়ন্ত্রণের মধ্যদিয়ে অথবা দ্বিদলীয় ব্যবস্থার মধ্যদিয়েও ফ্যাসিবাদী শাসন চলতে পারে। লেনিন বলেছিলেন, 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র হলো-কয়েক বছর অন্তর শোষক শ্রেণির হয়ে কারা সরকারে বসবে এবং জনগণকে শোষণ–অত্যাচার করবে নির্বাচনের দ্বারা এটাই নির্ধারিত হয়।' আমেরিকার গণতন্ত্র যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র তা স্পষ্ট হয়, যখন তারা অন্য দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে এবং অন্যায় হামলা-আক্রমণ, লুটপাট শুরু করেছে। নিজেদের স্বার্থে অন্য দেশের ওপর অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধী শিশু-নারী, সাধারণ নাগরিককে হত্যা করেছে। বিভিন্ন দেশের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা রক্ষার ও তার পরিপূরক শাসক বসানো সরানোর পুলিশী দায়িত্ব নিয়েছে। নিজ দেশে ধনকুবের গোষ্ঠীর হাতে রাষ্ট্র রাজনীতি, অর্থনীতি সমর্পণ করেছে।

আমেরিকা দেশের অভ্যন্তরে পুঁজিবাদী অর্থনীতি চালু রেখে ধনবৈষম্য বাড়িয়েছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য আড়াল করার জন্য এ ব্যবস্থাকে তারা গণতন্ত্র বলছে। এতদিন পর্যন্ত তারা যেটা করেতে পেরেছে, তা হলো দ্বিদলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটা স্থায়ী করতে। কিন্তু উগ্র জাত্যাভিমানের উন্মাদনায় মানুষের যুক্তিবাদী ধারার চিন্তা করার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে, গোটা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক, প্রচারযন্ত্র এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে পুরোপুরি দৃশ্য-অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রেখেছে। মানুষের মনন জগতে এমন একটা বিভ্রান্তিকর ধারণা তৈরি করতে পেরেছে যে, মার্কিন সমাজে সবকিছু অবাধ ও উন্মুক্ত। এবারের নির্বাচনে ব্যালটে আরও ছয় জনের নাম ছিল কিন্তু ওই দুজন ছাড়া আমেরিকার জনগণ বাকিদের নামই জানে না। কতজন রাষ্ট্রপতি প্রার্থীতার আবেদন করেছিল, কোন জটিল প্রক্রিয়ার কারণে তারা আসতে পারেনি, কী ছিল তাদের বক্তব্য কিছুই প্রচার পেল না। আমেরিকার বিদেশ নীতি কেমন? এটা নিয়ে মামুলি কথা বার্তা ছাড়া প্রকৃত ঘটনা আলোচনা হলো না। কত রাষ্ট্রে মার্কিন প্রশাসন যুদ্ধ বাধিয়েছে, মানুষ হত্যা করেছে, যুদ্ধ অপরাধ করেছে, সামরিক স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠায় মদদ দিয়েছে, রাষ্ট্র নায়কদের মার্কিন দস্যুতা নীতিবিরোধী হলেই হত্যা বা হত্যা চেষ্টা করেছে, তার যুক্তি ও দায় কোনটাই আলোচনায় নেই। এগুলো কি গণতান্ত্রিক নীতি? একটা গণতান্ত্রিক দেশ কখনও এধরনের অগণতান্ত্রিক-স্বেচ্ছাচারী, সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরদেশের জন্য গ্রহণ করতে পারে না। তার নিজ দেশের শ্রমিকদেরও বাস্তবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। তাদের আইন-কানুনগুলো অগণতান্ত্রিকতার উপাদানে ভরা। বাস্তবে, মালিকি ব্যবস্থা বহাল রাখার জন্য গণতন্ত্র আছে আর এর বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত কথা বলতে গেলে তার গণতন্ত্র নেই। সারা বিশ্বের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার নেতৃত্ব দিচ্ছে আমেরিকা; ইংল্যান্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু বিশ্বের ওপর তার যে, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা এটা এখন নানা ধরনের হুমকির মধ্যে পড়েছে। একটা উদাহরণ দেশে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য কোন পর্যায়ে গেলে ৯৯ ভাগ বনাম ১ ভাগ আন্দোলন আমেরিকাকে কাঁপিয়ে তুলতে পারে!

সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকা অবস্থায় আমেরিকা দেখাতে চেয়েছিল, তাদের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিশ্ব আর সোভিয়েতের নেতৃত্বে গণতন্ত্রহীন বিশ্ব। এভাবে দেশের ভেতরে উন্মাদনা এবং বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের একটা জয় জয়কার অবস্থা দেখাতে চেয়েছে। তারা ভেবেছিল সোভিয়েতের পতনের পর পুঁজিবাদী এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠবে। কিন্তু বিশ্বের বাজার দখলের প্রতিযোগিতা সে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা আর এককেন্দ্রিকতায় নেই। এখন একদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, একদিকে চীন এভাবে বিভিন্ন শক্তির উত্থান ঘটছে। আমেরিকার ডলারের একক নিয়ন্ত্রণও নানাভাবে ধাক্কা খাচ্ছে। বিশ্বে নানা ধরনের শক্তির বিন্যাস ঘটছে। সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার ব্যয় বহণ করতে গিয়ে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি দুর্বল হচ্ছে। যে কারণে তারা সবচেয়ে ধনী দেশ এবং সবচেয়ে বেশী ঋণগ্রস্ত দেশ। এতকিছুর পরও সে এতদিন তার দেশের অর্থনীতিকে যেভাবে রক্ষা করতে পেরেছিল পুঁজিবাদী বিশ্ব কর্তৃত্ব ধরে রেখেছিল এখন সেটা হুমকির মুখে পড়েছে। তার সাথে আভ্যন্তরীণ নানা ধরনের সংকটেরই একটা প্রতিফলন ঘটেছে ট্রম্পের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। এটা শুধু ট্রাম্পের পাগলামি মাতলামির বিষয় নয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে অন্য প্রেসিডেন্টের সাথে তুলনামূলক আচরণগত পার্থক্যের বিষয় নয়। বাস্তবে বহুকালের চাপা দেয়া সংকটগুলো চলতে চলতে এখন এমন জায়গায় এসেছে তারই বর্হিপ্রকাশ ট্রাম্পের মতো লোকের প্রেসিডেন্ট হওয়া এবং কংগ্রেস ভবনে হামলাসহ কর্মকাণ্ডগুলো।

আমেরিকার আরেকটা ব্যাপার হলো বিশ্ব ক্ষমতার মূলকেন্দ্র রক্ষা। এর জন্য নিজ দেশে বিশ্বের ধনকুবেরদের অন্যতম বড় বড় আমেরিকান ধনকুবের গোষ্ঠী, বিশাল সামরিক শক্তি-প্রশাসনিক শক্তি, তেল-অস্ত্র, সফটওয়ার, ভোগ্যপণ্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা আমেরিকার এই দুই পার্টিকেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পিছনে আছে। আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি–ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীনসহ অন্যান্য শক্তিকে মোকাবিলা করতে হয় এই দুই দলকে। তারা এখনও বিশ্বের এক নম্বর অর্থনীতির জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। জাতিসংঘ, ন্যাটোসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পিছনে তাদের একটা পরিমাণ অর্থ ব্যয় ছিল, বিভিন্ন দেশে তাদের শতাধিক সামরিক ঘাঁটি রক্ষণাবেক্ষণ এর ব্যয়গুলো তাদের

করতে হয়। কিন্তু এ ব্যয় থেকে তাদের লাভের পরিমাণই বেশি ছিল। এখন লাভের অঙ্ক কমতে থাকায় ট্রাম্প এ ব্যয় কমানোর কথা বলতে থাকে। এটা অন্যদের উপর একটা চাপ তৈরির কৌশলও বটে।

আমেরিকা তার সংকট মোকাবিলায় হিটলারের মতো একটা শ্বেতাঙ্গ উগ্র জাতিয়তাবাদী বোধ-ভাবমানস জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। অভিবাসী বিরোধী উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বের উন্মাদনা নতুনভাবে জাগানোর চেষ্টা চালিয়েছে। যে জন্য যুক্তিবাদী মনন, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, উদার মানসিকতাকে অবদমিত করতে হচ্ছে। মিডিয়াগুলোও এ নীতিগুলোকে নানা সমালোচনা সত্ত্বেও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে। সেখানে এক প্রেসিডেন্টের জায়গায় আরেক প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতায় আনবে কিন্তু আমেরিকার অগণতান্ত্রিক নীতিগুলো জনগণের সামনে উন্মোচিত করবে না। ট্রাম্পতো অনেক ভোট পেয়েছে; হয়তো জিতেও যেতো। কিন্তু অতীতের ও বর্তমানে দুটা গণআন্দোলন–৯৯ ভাগ শোষিত বনাম ১ ভাগ শোষকবিরোধী আন্দোলন এবং বর্ণবাদবিরোধী কালো-সাদা মানুষের মিলিত অধিকার আন্দোলন (ইষধপশ ষরাবং সধঃঃবৎ)–এগুলো নির্বিকার জনগণের মাঝেও ভোট আন্দোলনের মতো কাজ করেছে।

এ যুগের যেকোন আন্দোলন প্রগতির রাস্তাকে ত্বরান্বিত করে, অনেক অদৃশ্য বিষয়কে মানুষের সামনে দৃশ্যমান করে তোলে এবং শ্রমিকশ্রেণিকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেয়। আমেরিকার অভ্যন্তরীণ এই অব্যবস্থা হয়তো তারা অনেকটা নিষ্পত্তি করে ফেলতে পারবে। তবে তার জের চলতে থাকবে এবং আমেরিকার জনগণ এবং বিশ্ববাসীর মধ্যে ভাবনার অনেক উপাদান রেখে যাবে। এটাকে আমরা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সংকট এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনোভাবে বিকাশ হিসেবেই দেখছি। বিশ্বের যে কোন দেশেই এখন বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ বিরোধী মনোভাব বিস্তার ও সংগ্রামী পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের দেশেও এটার একটা প্রভাব পড়বে।

আমেরিকা একপর্যায়ে মধ্যপ্রাচ্যের অস্ত্রের বাজারটা প্রায় হাত ছাড়াই করে ফেলছিল। ট্রাম্প সংযুক্ত আরব আমিরাত, মরক্কো, সুদানের সাথে ইসরাইলের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে তার অবস্থা আগের চেয়ে বেশ অনুকূলে নিয়ে এসেছে। তার অস্ত্রের বাজার হয়ে ওঠলো ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ইসরাইল, মরক্কো, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর। আমেরিকা বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক কর্তৃত্ব রক্ষার নীতি থেকে সরবে না শুধু কখনও যুদ্ধ কৌশল কখনও শান্তি কৌশলে চলবে।

এখন বিশ্ব অর্থনীতির মেরুকরণ আর আগের মতো নেই। নতুন মেরুকরণ হচ্ছে। একদিকে আমেরিকা, ভারত, ইসরাইল, জাপান, সৌদি ইত্যাদি মিলে একটা কেন্দ্র; অন্যদিকে চীন, রাশিয়া, তুরস্ক, ইরান, উত্তর কোরিয়া আরেকটা কেন্দ্র–উভয় দিক থেকেই মেরুকরণ সম্প্রসারণ চেষ্টা চলছে, বিশ্বকে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে বুর্জোয়া শিবিরের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের যে চেহারা দেখা গেল তা কালক্রমে যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, সামরিক-প্রশাসনিক-বিচারিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদিতে আবর্তিত হতে পারে তবে নিরানব্বই ভাগ বনাম একভাগ আন্দোলনটি যদি পুনর্গঠিত হয়ে উঠতে পারে তবেই আমেরিকা সংকট থেকে বেরোবার একটা পথ পেতে পারে। এটা সময় সাপেক্ষ হলেও অসম্ভব কিছু নয়। এটা দুনিয়া বদলের সংগ্রামে প্রেরণা জোগাবে। পৃথিবীর দেশে দেশে তাই আন্দোলনের যত ইস্যু তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে অর্থনৈতিক বঞ্চনা দূর করা ও নাগরিক অধিকারের বিষয়টি প্রধান হয়ে দেখা দিচ্ছে। আমাদেরও মানুষের মর্যাদা ও সভ্যতার দাবি নিয়ে বাঁচতে হলে বৈষম্য ও দমনপীড়নের বিপরীতে সাম্য সমাজতন্ত্রের সংগ্রামকে পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী করতে হবে।